এপ্রিল - জুন ২০১৬

ISSN 2222-5188

ইনফো

৫ম পর্ব, ২য় সংখ্যা

# মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

## লিভার সিরোসিস

# সূচী


| | |
|---|---|
| বিশেষ প্রবন্ধ | ৩ |
| চমকপ্রদ তথ্য | ৬ |
| জনস্বাস্থ্য | ৭ |
| প্রশ্ন-উত্তর | ১০ |
| চিকিৎসা | ১১ |
| ইনফো কুইজ | ১৪ |
| স্বাস্থ্যকথা | ১৫ |



**সম্পাদক মণ্ডলী**

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম রহমান
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক



**প্রকাশনায়**

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

**ডিজাইন**

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২


# সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

নতুন চিকিৎসা সম্পর্কীয় তথ্য এবং কিছু পরিচিত রোগ নিয়ে ইনফো মেডিকাস চিকিৎসা সাময়িকীর আরেকটি সংখ্যা আপনাদের হাতে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত বোধ করছি। আশা করছি নতুন সংখ্যাটির তথ্যগুলো আপনাদের ভালো লাগবে।

বাংলাদেশের অনেক মানুষ লিভার বা যকৃত এর রোগে ভুগছেন। লিভারের অনেক রোগের মধ্যে লিভার সিরোসিস অন্যতম। লিভার সিরোসিস একটি ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ যাতে লিভারের সাধারণ গঠন বা আর্কিটেকচার নষ্ট হয়ে যায়। ফলে লিভার তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই লিভার সিরোসিস থেকে লিভারে ক্যান্সারও দেখা দিতে পারে। তাই এবারের "বিশেষ প্রবন্ধে" লিভার সিরোসিসের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে সবথেকে আলোচিত ঘটনা হচ্ছে যিকা ভাইরাস। আর এটা নিয়ে এবারের "চমকপ্রদ তথ্য" বিভাগটিতে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে এবং যাদেরকে বাধ্য হয়ে প্রচণ্ড গরমে খোলা জায়গায় বা মাঠে চলাফেরা বা কায়িক পরিশ্রম করতে হয় তখন একধরনের জটিলতা দেখা দেয় যার নাম হচ্ছে হিট স্ট্রোক। হিট স্ট্রোক এক প্রকার মেডিকেল ইমার্জেন্সি যেখানে রোগীকে সাথে সাথে চিকিৎসা না দেয়া হলে রোগী মৃত্যুবরন করতে পারে। তাই হিট স্ট্রোক এর চিকিৎসা ও প্রতিকার "জনস্বাস্থ্য" বিভাগে তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে বিষক্রিয়া হলে কি করনীয় তা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এই বিভাগে।

হিমোফিলিয়া হচ্ছে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ জাতীয় বংশগত রোগ যা সাধারণত ক্রোমোজমের কিছু গঠনগত বিকৃতির কারণে হয়ে থাকে। এই রোগে শরীরের কোনো অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হলে তা আর জমাট বেঁধে বন্ধ হতে পারে না। এবারের "চিকিৎসা" বিভাগে হিমোফিলিয়া কি, কেন হয় ও এর চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সিফিলিস ও ঘামাচি রোগের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়েছে এই বিভাগে।

সবশেষে আমাদের সাথে সব সময় থাকার জন্য এ সি আই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

**(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)**
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

# লিভার সিরোসিস

লিভার সিরোসিস একটি মারাত্মক ও অনিরাময়যোগ্য রোগ। এতে লিভার বা যকৃত এর কোষকলা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে তা সম্পূর্ণ বিকৃত ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে যকৃতের যেসব স্বাভাবিক কাজ আছে যেমন বিপাক ক্রিয়া, পুষ্টি উপাদান সঞ্চয়, ওষুধ ও নানা রাসায়নিকের শোষণ, রক্ত জমাট বাঁধার উপকরণ তৈরি ইত্যাদি কাজ ব্যাহত হয় যার ফলে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা। ধীরে ধীরে এই রোগ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

## সিরোসিস কি

লিভার সিরোসিস একটি ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী রোগ যাতে লিভারের সাধারণ গঠন বা আর্কিটেকচার নষ্ট হয়ে যায়। ফলে লিভার তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই লিভার সিরোসিস থেকে লিভারে ক্যান্সারও দেখা দিতে পারে। তবে এসব কোন কিছুই হার্ট এ্যাটাক বা ব্রেন স্ট্রোকের মতো সহসা ঘটে না। সিরোসিসে আক্রান্ত রোগী বহু বছর পর্যন্ত কোন রকম রোগের লক্ষণ ছাড়াই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম ধরা যায় যে আমাদের লিভারটা একটা আধুনিক এপার্টমেন্ট যাতে সব আধুনিক সুযোগ সুবিধাই বিদ্যমান। এই এপার্টমেন্টের একটি কল নষ্ট থাকতে পারে কিংবা নষ্ট থাকতে পারে পুরো পানির সাপ্লাই লাইন। ঠিক একইভাবে লিভার সিরোসিসে সামান্য কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে কিংবা সমস্যাটি হতে পারে অনেক বড় কিছু। একটা পানির কল নষ্ট হলে যেমন এপার্টমেন্টের অধিবাসীদের কোন সমস্যা হয় না তেমনি প্রাথমিক বা কম্পেনসেটেড লিভার সিরোসিসেও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তেমন কোন অসুবিধা হয় না। রোগের লক্ষণগুলো দেখা দেয় ডিকম্পেনসেটেড বা এ্যাডভান্সড লিভার সিরোসিসের ক্ষেত্রে যখন ঐ এপার্টমেন্টে পুরো পানির সাপ্লাই লাইন নষ্ট হয়ে যায়।

## কারণ

দেশ ভেদে সিরোসিসের কারণগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার সিরোসিসের প্রধান কারণ হচ্ছে এ্যালকোহল এবং হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। বাংলাদেশে প্রায় আড়াই হাজার রোগীর উপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে লিভার সিরোসিসের প্রধান কারণ ভিন্ন। নিম্নে বাংলাদেশে লিভার সিরোসিসের কারণগুলো দেয়া হলোঃ

- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (প্রধান কারণ)
- ফ্যাটি লিভার (প্রধান কারণ)
- হেপাটাইটিস সি ভাইরাস
- এ্যালকোহল

আবার, ফ্যাটি লিভার হওয়ার কারণগুলো হচ্ছেঃ

- ডায়াবেটিস
- ডিজলিপিডেমিয়া (রক্তে চর্বি বেশী থাকা)
- ওবেসিটি (মেদ ভুড়ি)
- উচ্চরক্তচাপ
- হাইপোথাইরয়ডিজম

পাশ্চাত্যে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত প্রায় ৩০ শতাংশ রোগী পরবর্তীতে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হন। বাংলাদেশেও ফ্যাটি লিভারজনিত লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

## লক্ষণ

লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীর নানা রকম উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়। নিচে লক্ষণগুলো দেয়া হলোঃ

- বমি বমি ভাব ও বমি হতে পারে
- রক্তবমি হতে পারে
- পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে
- জ্বর জ্বর ভাব হতে পারে
- ঘনঘন পেট খারাপ হতে পারে
- দুর্বলতা অনুভব হতে পারে
- অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে
- দাঁতের মাঁড়ি বা নাক থেকে রক্ত পড়তে পারে
- পেটের ডান পাশে ব্যথা অনুভব হতে পারে
- ফুসফুসে পানি আসে যার জন্য পেট ফুলে যেতে পারে

- মাংস পেশীতে ব্যাথা হতে পারে
- ওজন কমে যেতে পারে
- মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হতে পারে
- নখ সাদা হয়ে যেতে পারে
- চোখ অক্ষিকোটরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে
- অণ্ডকোষ ছোট হয়ে যেতে পারে
- ছেলেদের স্তন বড় হয়ে যেতে পারে
- মেয়েদের স্তন ছোট হয়ে যেতে পারে

স্পাইডার নেভাস

উপরোক্ত লক্ষণগুলো ছাড়াও আরো কিছু লক্ষণ দেখা যায় যেসব একজন চিকিৎসক দেখে বুঝতে পারেন যে কারো লিভার সিরোসিস হয়েছে কিনা। সেসব লক্ষণগুলো হচ্ছেঃ

- স্পাইডার নেভাস - এটা চামড়ার ঠিক নিচে পাওয়া যায়। এটার মাঝখানে একটি লাল রঙের স্পট বা বিন্দু থাকে এবং এই বিন্দু থেকে অনেকগুলো রক্তনালী জালের মত বের হয় যা দেখতে অনেকটা মাকড়শার জালের মত
- কেপুট মেডুসা বা নাভির চারপাশ ফুলে যাওয়া
- হাত যদি সোজা করে রাখতে বলা হয় তাহলে দেখা যাবে যে হাত কাঁপছে

## ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস

- হেপাটোমেগালী বা লিভার বড় হয়ে যাওয়া
- স্প্লিনোমেগালী বা স্প্লিন (প্লীহা) বড় হয়ে যাওয়া
- এসাইটিস বা পেটে পানি আসা
- জন্ডিস
- অন্ত্রে রক্তক্ষরণ

## পরীক্ষা

- লিভার ফাংশন পরীক্ষা -
  - বিলিরুবিন বেড়ে যাবে
  - এলানিন এমাইনোট্রান্সফারেজ (ALT) কমে যাবে
  - এসপারটেট এমাইনোট্রান্সফারেজ (AST) কমে যাবে
  - এলকালিন ফসফাটেজ (ALP) বেড়ে যাবে
  - এলবুমিন কমে যাবে
- লিভার বায়োপ্সি (নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা)
- ভাইরাল মার্কার -
  - হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পরীক্ষা
  - হেপাটাইটিস সি ভাইরাস পরীক্ষা
- ইমেজিং -
  - আল্ট্রাসনোগ্রাম
  - এম আর আই
  - সি টি স্ক্যান

## চিকিৎসা

লিভার সিরোসিস চিকিৎসার মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিরোধ। সিরোসিস একবার হয়ে গেলে তারপর যদি চিকিৎসা করা হয়, তারপরও শরীর পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। নিচে লিভার সিরোসিসের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

- যেসব কারণে লিভার সিরোসিস হয়ে থাকে, সেসব কারণ প্রতিরোধ করতে হবে
- সিরোসিসে আক্রান্ত যে কোনো ব্যক্তির দ্রুত লিভার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নেয়া এবং নিয়মিত ফলোআপে থাকা উচিত। এতে দীর্ঘদিন ভালো থাকা যায়
- পাশাপাশি সিরোসিসের কারণ শনাক্ত করে তার চিকিৎসা করা গেলে লিভার খারাপের দিকে যাওয়ার ঝুঁকিও অনেক কমে যায়
- লিভার সিরোসিস হয়েছে এমন কেউ যখন প্রাথমিক অবস্থা থেকে কিছুটা খারাপ অবস্থায় আসে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে চলে যায় তখন লিভার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। লিভার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ডিকমপেনসেটেট অবস্থায় চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তবে তা অনেক ব্যয়বহুল চিকিৎসা
- কিছু ওষুধ আছে যেগুলো লিভার সিরোসিসে ভালো কাজ করে যেমনঃ Ursodioxycolic acid, Antifibrinolytic drugs and Anti-inflammatory drugs

## লিভার সিরোসিস রোগীর খাবার

লিভার মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি এবং এর প্রধান কাজই হলো বিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করা। সুতরাং সিরোসিস রোগে লিভারের বিপাকক্রিয়ার ক্ষতি হয়। তাই এ রোগীদের উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। লিভার সিরোসিসে রোগটি যদি বেশি অগ্রসর না হয় তাহলে উপযুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা

সম্ভব। প্রোটিন এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রদাহজনিত লিভার রোগে অত্যন্ত উপকারী। এ অবস্থায় রোগটি যদি এগিয়ে যায় তবে আবার খাদ্য তালিকায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

### প্রোটিন

প্রোটিনের মাত্রা অবশ্যই রোগীর রোগের খারাপ বা ভালো অবস্থান দেখে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনেকে মনে করেন নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য প্রথমে প্রয়োজন অনুযায়ী ভালো মানের প্রোটিন দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এর মাত্রা কমাতে হবে যাতে হেপাটিক কোমা না হয়। হেপাটিক কোমার লক্ষণ দেখা দিলে প্রোটিন প্রতিদিন ৩৫ গ্রামের নিচে দিতে হবে।

### তেল

লিভার সিরোসিসে তেলের শোষণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীকে তৈলাক্ত খাবার পরিহার করতে বলা হয়। খাদ্যের পরিবর্তন করে মধ্যম মানের চেইন সম্বলিত ট্রাইগ্লিসারাইড দিতে হিবে। আর ট্রাইগ্লিসারাইড হল আমরা যে খাবার খাই তার মধ্যে বেশীরভাগ স্নেহ পদার্থের রাসায়নিক রূপ।

### শ্বেতসার

রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালরি দিতে হবে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে। প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৩৫ থেকে ৫০ কিলোক্যালরি শ্বেতসার প্রয়োজন হয়। অনেক রোগীর ক্ষুধামন্দা ও বমি বমি ভাবের জন্য পর্যাপ্ত ক্যালরি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে রোগীর পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী যে খাবারটি খেতে চায় সেটি বিবেচনায় আনতে হবে। কোন কোন রোগীকে তিনবেলা খাবার দেয়ার পরিবর্তে অল্প অল্প করে বারে বারে খাওয়াতে হয়।

### ভিটামিন এবং খনিজ

লিভার সিরোসিসে অন্ত্রে খাদ্য শোষণে ব্যাঘাতের জন্য চর্বি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন সি এবং বি শোষণে ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়াও রক্তে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিংকের মাত্রা কমে যায়। কম প্রোটিন, জীবাণুনাশক থেরাপি, বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া হওয়ার কারণে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রাও কমে যায়। সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। লিভারে যেসব ভিটামিন জমা থাকে তার রিজার্ভ রাখতে হবে এবং টিস্যুর ক্ষয়পূরণের জন্য ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে, বিশেষ করে যদি রোগীর ক্ষুধামন্দা থাকে।

### সোডিয়াম

শরীরে পানি জমলে সোডিয়াম পরিমিত পরিমাণে দিতে হবে। অতিরিক্ত জমা হওয়া পানি কার্যকরভাবে বের করার জন্য অনেক মাস ধরে বেশিমাত্রায় সোডিয়াম খাওয়া সীমিত করতে হয়। এই অবস্থায় মাত্র ৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম প্রতিদিন দিতে হয়। এজন্য দৈনিক ২৫০ মিলিলিটারের বেশি দুধ খাওয়া উচিৎ না। পরিমাণমতো প্রোটিন দেয়ার ক্ষেত্রেও সোডিয়ামের ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

### পানি

লিভার সিরোসিসে রোগীদের আগের দিন হওয়া প্রস্রাবের সমপরিমাণ পানি খেতে বলা হয়। তবে সোডিয়াম সীমিত করার ফলে যদি শরীরে পানি না থাকে তবে পানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই।

## জটিলতা

- হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি
- ভেরিসিয়াল ব্লিডিং
- রেনাল ফেইলিউর
- লিভার ক্যান্সার
- হেপাটোরেনাল সিনড্রোম
- এসাইটিস
- জীবাণুর সংক্রমণ

## আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা

লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। মাত্র ২৫% রোগী রোগ নির্ণয়ের ৫ বছরের মধ্যে মারা যায়। যদি লিভারের কার্যকারিতা ভালো থাকে তাহলে ২৫% রোগী ১০ বছর বেঁচে থাকে।

## প্রতিরোধ

লিভার সিরোসিসে সেরে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সিরোসিস থেকে লিভার ক্যান্সারও হতে পারে। তাই রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধ করাই ভালো। হেপাটাইটিস বি ও সি সংক্রমণ থেকে বাঁচতে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, যেমন শিরায় নেশাদ্রব্য ব্যবহার, অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ এড়াতে হেপাটাইটিস বি টিকা নিতে হতে। অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান এড়িয়ে চলতে হবে। হেপাটাইটিসে সংক্রমণ হলে ঝাড়ফুঁক জাতীয় চিকিৎসা না করে দ্রুত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা নিতে হবে।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# চমকপ্রদ তথ্য

## যিকা ভাইরাস-নতুন আপদ

দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপকভাবে একটি নতুন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে যার নাম হচ্ছে যিকা ভাইরাস (Zika virus)। যিকা ভাইরাস ১৯৪৭ সালে সর্বপ্রথম শনাক্ত হয়েছিল উগান্ডায়। যিকা ভাইরাস মূলত এডিস মশা দিয়ে ছড়ায়। যিকা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে জ্বর, মাংসপেশীতে ব্যথা, চোখে ব্যথা, অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করা এবং ত্বকে লাল লাল দানা বা ফুসকুড়ি উঠতে পারে। যিকা ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশের পরে ডেঙ্গুর মতো উপসর্গ দেখা দিলেও বিগত ৬০ বছরের পর্যবেক্ষণে কখনও যিকা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে ডেঙ্গুর মত রক্তক্ষরণ হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু গর্ভবতী মা যদি যিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে নবজাতক শিশু ছোট মাথা বা মাইক্রোসেফালি (Microcephaly) নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। যিকা ভাইরাসের বিরুদ্ধে এখনও কোন টিকা আবিস্কার হয়নি। যিকা ভাইরাসের ক্ষতিকর জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে যিকা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করা।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

## অপর্যাপ্ত ঘুম শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশে ক্ষতিকর

অপর্যাপ্ত ঘুম শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর ঠিকমত ঘুম হয় না তারা বুদ্ধির পরীক্ষায় খারাপ করে। এই গবেষণায় ১০ বছর বয়সী কিছু শিশুর উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে যেসব শিশুদের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি তারা বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় খারাপ করেছে। কারণ পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়ার কারণে মস্তিষ্কের সুরক্ষামূলক তরঙ্গ বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলে সেসব শিশুর ঘুম কম হয়েছে তারা বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় খারাপ করেছে। শুধু মাঝরাতে বা শেষরাতে ভাল ঘুম নয় বরং সারারাত ভাল ঘুম হলে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ভাল হয়। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের ওপর ঘুমের অভাব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কারণ ওই বয়সটি বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

## প্রথম আলাদা হলো সব থেকে কম বয়সী জোড়া যমজ শিশু

সুইজারল্যান্ডে এক মেডিকেল টিম সম্প্রতি জোড়া যমজ কন্যা শিশুকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সফলভাবে আলাদা করেছে। জোড়া যমজ শিশুর বয়স ছিল মাত্র ৮ দিন। জন্ম থেকেই তাদের পেট একসঙ্গে জোড়া লাগানো ছিল। একটা যকৃত নিয়েই তারা পার করেছে ছয় মাস। সব থেকে কম বয়সে জোড়া যমজ শিশু আলাদা করার ঘটনা এটাই প্রথম। ১৮ জন চিকিৎসক ও নার্সের একটি টিম টানা সাতঘণ্টা এ অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। অপারেশনের সময় একজনের রক্তচাপ নেমে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সমস্যা হয়নি। রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে শিশুটিকে আইভি ফ্লুইড দেওয়া হয় ও রক্ত প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে শিশু দুই জন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# হিট স্ট্রোক

মানুষের শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এক ধরণের জটিলতা দেখা দেয় যার নাম হচ্ছে হিট স্ট্রোক। যখন প্রচণ্ড গরম পড়ে তখন হিট স্ট্রোক বেশি দেখা দেয়, বিশেষ করে যাদেরকে বাধ্য হয়ে প্রচণ্ড গরমে খোলা মাঠে চলাফেরা বা কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। গরমে অনেক বিপদের মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থার নাম হিট স্ট্রোক। স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা ৯৮° ফারেনহাইট। যদি তাপমাত্রা ১০৪° ফারেনহাইট অতিক্রম করে তখনি হিট স্ট্রোক হতে পারে। হিট স্ট্রোক এক প্রকার মেডিকেল ইমার্জেন্সি যেখানে রোগীকে সাথে সাথে চিকিৎসা না দেয়া হলে রোগী মৃত্যুবরন করতে পারে। রোগীকে গরম থেকে সরিয়ে এনে তার দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে আনা হিট স্ট্রোকের চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

## শ্রেণীবিভাগ

- অপুষ্টি জনিত হিট স্ট্রোকঃ এই ধরণের হিট স্ট্রোক বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধ অথবা যারা অপুষ্টিতে ভুগেন তাদের হয়
- অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম জনিত হিট স্ট্রোকঃ এই ধরণের হিট স্ট্রোক তীব্র শারীরিক কার্যকলাপের কারণে তরুণ বয়সে বা যে কোন সুস্থ ব্যক্তিদের হঠাৎ করে হতে পারে

## কারণ

হিট স্ট্রোকের প্রধান কারণ হচ্ছে পানিশূন্যতা। প্রচণ্ড গরমে দেহে পানির পরিমাণ কমে গেলে হিট স্ট্রোক হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত গরমের সময় ভারী শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করলেও হিট স্ট্রোক হতে পারে।

## লক্ষণ

- মাথা ঝিম ঝিম করা
- বমি করা
- দুর্বলতা অনুভব করা
- অবসাদ অনুভব করা
- মাথাব্যথা করা
- মাংসপেশির খিঁচুনি হওয়া
- চোখে ঝাপসা দেখা
- ঘামের অনুপস্থিতি, চামড়া খসখসে ও লাল হয়ে যাওয়া
- হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পাওয়া
- শ্বাসকষ্ট হওয়া
- দৃষ্টিবিভ্রম বা হ্যালুসিনেশন হওয়া
- কোমায় চলে যাওয়া

## যারা আক্রান্ত হয়

ছোট শিশু, বয়স্ক মানুষ, ব্যায়ামবিদ বা দিনমজুরদের হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খুবই বেশি। শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি খুবই ভয়াবহ কারণ তাদের শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা পরিপক্ব নয়। এছাড়া বৃদ্ধরাও এতে আক্রান্ত হতে পারে কেননা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের দেহের তাপ নিয়ন্ত্রন করার ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে তাদের হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

## প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রথমেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরীরের তাপমাত্রা কমাতে হবে (যদি তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইটের উপরে থাকে), এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ফ্যানের বাতাস বা এসি সুবিধা থাকলে সেখানে নিয়ে যাওয়া, গ্রামীণ জনপদে আক্রান্ত রোগীকে গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করা। যদি রোগী সরাসরি রোদ বা অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে আসেন তা হলে প্রথমেই শরীর ঠান্ডা করতে হবে এবং দুই থেকে এক মিনিট পর মাথায় পানি দিতে হবে। প্রথমেই সরাসরি মাথায় পানি দিলে পরিস্থিতি অন্য দিকে চলে যেতে পারে। তবে যদি রোগী সরাসরি রোদ থেকে না আসে তা হলে মাথায় পানি দিতে অসুবিধা নাই।

গায়ের ভারি কাপড় যতো দ্রুত সম্ভব খুলে দিতে হবে, গায়ে ও কপালে ঠাণ্ডা কাপড় ভিজিয়ে হাল্কা ভাবে চেপে চেপে স্পঞ্জ করতে হবে, এতে গায়ের ঘাম মিলিয়ে যাবে, বগল ও রানের খাঁজে বরফ দিতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হলে মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি আক্রান্ত রোগী পানি খাওয়ার মত অবস্থায় থাকেন তাহলে ঠান্ডা

পানি পান করাতে হবে। যতক্ষণ তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইটের নিচে না আসছে ততক্ষণ এ প্রক্রিয়া বার বার করতে হবে। এতে যদি ভালো ফল পাওয়া না যায় তাহলে রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানোর চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় হাসপাতাল দূরে থাকায় অনেক রোগী পথেই মারা যেতে পারে, সে জন্য প্রাথমিক চেষ্টাই সবচেয়ে বড় সফলতা আনতে পারে।

### প্রতিরোধ

- গরমের সময় দেহকে পানিশূন্য হতে না দেয়া
- শরীরে পানির পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে প্রচুর পরিমাণ পানি, ডাবের পানি পান করা
- বেশি গরমের সময় ব্যায়াম বা ভারি কায়িক পরিশ্রম না করা
- গরমে বাইরে বের হলে সাদা বা হালকা রঙের কাপড় পরে বাইরে বের হওয়া
- ঘামের সাথে দেহের লবণ বের হয়ে যায়, সেজন্য দূর্বল লাগলে খাবার স্যালাইন খাওয়া

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

## বিষক্রিয়া

বড়দের অসতর্কতার কারণে বাচ্চারা ভুলবশত বিষ পান করতে পারে আর বড়রা অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ করে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অথবা মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে বিষপান করতে পারে। সাধারণত যেসব বিষপানের রোগী পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কীটনাশক পান করা, অনেক পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়া, কেরোসিন পান করা, ধুতরার বীজ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া, কোনো ওষুধ ভুলক্রমে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলা, বিষাক্ত মদ্যপান বা অতিরিক্ত মদপান করা ইত্যাদি। কেউ যদি বিষপান করে তাহলে দেরী না করে তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

### বিষের প্রকারভেদ

**প্রদাহ সৃষ্টিকারী বিষ**

- কেরোসিন
- তারপিন তেল
- রঙ এবং রঙ পাতলাকারক দ্রব্য
- পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্য

**পোড়া ও ক্ষত সৃষ্টিকারী বিষ**

- অম্ল বা এসিড
- ক্ষার বা এলকালি
- গৃহে ব্যবহৃত বিশোধক
- গোসলখানা, পায়খানা ও নর্দমা পরিষ্কারক বিশোধক

### চিকিৎসা

রোগী কোন ধরণের বিষ পান করেছে তা রোগীর মুখ, মুখগহ্বর ও শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করে অতি সহজেই অনুমান করা যায়। পোড়া ও ক্ষত সৃষ্টিকারী বিষপানে রোগীর মুখ ও মুখগহ্বরে পোড়া ক্ষত বা ফোসকা দেখা যাবে। কেরোসিন জাতীয় বিষপানে রোগীদের শ্বাসে উক্ত দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাবে। রোগী শ্বাস নিতে না পারলে তাকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিতে হবে। সজ্ঞান রোগীকে সর্বপ্রথম একগ্লাস পানি বা দুধ পান করানো ভালো কারণ এতে বিষ পাতলা হয়ে যায় ও বিষের ক্ষতির প্রভাব কমে আসে। শিশুদের ক্ষেত্রে আধা গ্লাসের মতো পানি বা দুধ পান করানো ভালো। অজ্ঞান রোগীকে তরল দেয়া যাবে না, তাকে সুবিধাজনক স্থানে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীকে বমি করানো উচিত কিনা তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ সকল বিষপানের পর বমি করানো যাবে না।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রোগীকে বমি করানো যাবে না কিছু বিষ প্রবেশের সময় মুখ, মুখগহ্বর ও অন্ননালীতে প্রদাহের বা দগ্ধতার সৃষ্টি করে অথবা ফুসফুসে প্রবেশ করে সংক্রমণের সৃষ্টি করে এরূপ বিষপানের রোগীকে কোনো ক্রমেই বমি করানো উচিত নয়, কারণ বমি করার সময় উল্লেখিত পদার্থগুলো পুনরায় ক্ষতিসাধন করে ক্ষতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কোনো রোগী ৪ ঘণ্টার ভেতর বিষ খেয়ে থাকলে এবং জ্ঞান থাকলে রোগীকে বমি করানো যেতে পারে। বমি করানোর সময় বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যেন বমিকৃত কোনো জিনিস বা পানীয় ফুসফুসে প্রবেশ না করে এজন্য বমি করানোর সময় রোগীর মাথা নিচের দিকে ও মুখ পাশে কাত করিয়ে রাখতে হবে। বিষপানে আক্রান্ত রোগীকে বমি করানোর কিছু উপায় নিচে দেওয়া হলোঃ

- মুখের মধ্যে আঙুল প্রবেশ করিয়ে বমি করানো যায়
- খারাপ স্বাদযুক্ত ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম স্বল্প গরম দুধসহ বা স্বল্প গরম লোনা পানি পান করালে অনেকেরই সহজে বমি হয়ে যায়
- তিতা কোনো দ্রব্য মুখের মধ্যে দিয়েও বমি করানো যেতে পারে

## কেরোসিনের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে

সাধারণত বাচ্চারা না বুঝে কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলে। এ ধরণের রোগী মুখে, শ্বাস প্রশ্বাসে, বমিতে, প্রস্রাবে ও কাপড় চোপড় থেকে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যাবে। রোগীর পাতলা পায়খানা, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ, জ্বর, নাড়ি দুর্বল ও অনিয়মিত হতে পারে। এছাড়া রোগী গলায় জ্বালাপোড়া ও পেটে ব্যথা অনুভব করবে। এ ধরনের রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এই রোগীর বমি, পাকস্থলী পরিস্কার বা স্টোম্যাক ওয়াশ দেয়া যাবে না। এ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যাতে নিউমোনিয়া বা ফুসফুসে অন্য কোনো সংক্রমণ না হতে পারে।

## এসিড কিংবা ক্ষারের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে

এসিড কিংবা ক্ষারের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করা যাবে না। ক্ষতের ওপর প্রলেপ সৃষ্টি করে এমন খাদ্যবস্তু যেমন দুধ, ডিমের সাদা অংশ খাওয়ানো যেতে পারে। মুখ বা শরীরের কোনো অংশে এসিড অথবা ক্ষার পড়লে সেখানে প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে। এসিড খেলে এন্টাসিড সাসপেনশন দেয়া যেতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

## বিষের বিরুদ্ধে কার্যকর ঔষধ প্রয়োগ

কিছু বিষকে নিষ্ক্রিয় করার কিছু ওষুধ রয়েছে। রোগী কোন বিষ দ্বারা আক্রান্ত তা জানতে পারলে সেই বিষকে নিষ্ক্রিয় করার ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীর অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। বিষের বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

## প্রতিরোধ

আমাদের দেশের ক্ষেত খামারে পোকা মারার জন্য অনেক ধরণের বিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া কেরোসিন, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। দুর্ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিষক্রিয়া চিকিৎসার চেয়ে এর প্রতিরোধ নিরাপদ এবং সহজ। নিজের ঘরবাড়ি, কর্মস্থলকে নিরাপদ রাখার জন্য কৃষক, কলকারখানায় ও মাঠে খামারে নিয়োজিত কর্মী, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, বাবা মা, ছাত্র ছাত্রী বা ছেলেমেয়ে সবার ভূমিকা রয়েছে। নিচে বিষক্রিয়া প্রতিরোধের কিছু উপায় আলোচনা করা হলোঃ

- যে কোন ধরণের কেমিক্যাল বা রাসায়নিক সামগ্রী নিরাপদভাবে ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করতে হবে
- রাসায়নিক সামগ্রী নিরাপদে রাখা, ব্যবহার করে তা সরিয়ে নিরাপদে রাখতে হবে। শিশুর নাগালের বাইরে কীটনাশক, ওষুধ ও পরিষ্কারকরণ সামগ্রী (স্যাভলন) রাখতে হবে
- প্রয়োজন নেই এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ ঘরে না রাখা
- খাবার জিনিসের কোন পাত্রে রাসায়নিক সামগ্রী রাখা উচিৎ না, কারণ ভুলবশত কেউ খাবার কিংবা পানীয় মনে করে খেতে বা পান করতে পারে
- যথাযথ পরিমাণ ও যথাযথভাবে কীটনাশক, ওষুধ ও পরিষ্কারকরণ সামগ্রীর বোতলের গায়ে আঁটা লেবেল পড়ে নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা। পড়তে না পারলে অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে। লেবেলহীন বোতল থেকে রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহার করা উচিৎ না

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# প্রশ্ন-উত্তর

## প্রশ্নঃ কর্মজীবি মায়েরা শিশুর জন্য বুকের দুধ বাড়িতে রেখে গেলে তা কতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে?

**উত্তর**

কর্মজীবি মায়েরা বাইরে যাওয়ার সময় শিশুর জন্য বুকের দুধ নিঃসৃত করে ঢাকনা দেওয়া পরিষ্কার বাটিতে রেখে যেতে পারেন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আট ঘণ্টা পর্যন্ত এটি ভালো থাকে। রেফ্রিজারেটরে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে অবশ্যই শিশুকে খাওয়ানোর বেশ আগে রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে নিতে হবে।

## প্রশ্নঃ উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগীরা কি জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেতে পারবে?

**উত্তর**

যাদের বয়স ৪০ এর উপরে, দীর্ঘদিন যাবত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং রক্তচাপ বা রক্তের শর্করা বা সুগার কোনোটাই ভালো নিয়ন্ত্রণে নেই, তাঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি না খাওয়াই ভালো। এটি হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকেরও ঝুঁকি বেড়ে যায়। এসব রোগীর জন্য অন্যান্য কম ঝুঁকিপূর্ণ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করাই শ্রেয়।

## প্রশ্নঃ কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণী কামড় দিলে র‍্যাবিস ভ্যাকসিন কত সময়ের মধ্যে এবং কোথায় দিতে হবে?

**উত্তর**

পাগলা কুকুর বা অচেনা কুকুর (রাস্তার) কামড়ালে যত দ্রুত সম্ভব টিকা দেওয়া শুরু করতে হবে। মোট পাঁচটি ডোজ দিতে হবে। ডোজের সময়কাল হচ্ছেঃ ০ দিন, ৩ দিন, ৭ দিন, ১৪ দিন ও ২৮ তম দিন। এই টিকা বাহুর মাংসপেশিতে দেয়া হয়। এই টিকা বর্তমানে বাংলাদেশের সব জায়গায় পাওয়া যায়।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# হিমোফিলিয়া

হিমোফিলিয়া হচ্ছে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ জাতীয় বংশগত রোগ, এটি মামা ভাগ্নে রোগ নামেও পরিচিত। এই রোগে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। এ রোগ পুরুষদের হয়, তবে নারীরা এ রোগের জিনের বাহক। হিমোফিলিয়াকে বলা হয় রাজাদের রোগ, পক্ষান্তরে রোগের রাজা। ইউরোপের অনেক রাজবংশে এবং রাশিয়ার রাজাদের এই রোগ ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৭ এপ্রিলকে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস (World Haemophilia Day) হিসেবে ঘোষণা করেছে।

## সংক্রমণ

এটি একটি বংশগত রোগ, তবে লক্ষণীয় বিষয় হল সাধারণত ছেলেদের এই রোগ হয় এবং মেয়েরা এই রোগ বহন করে। মায়ের নিকট থেকে ছেলেরা এই রোগ পায় এবং দেখা যায় মামাদেরও এই রোগ থাকে। বাবার নিকট থেকে ছেলেরা কখনো এই রোগ পায় না।

## কারণ

হিমোফিলিয়া হওয়ার কারণ ক্রোমোজমের নির্দিষ্ট কিছু গঠনগত বিকৃতি। এতে রক্তে ফ্যাক্টর ৮ (Factor VIII) বা ফ্যাক্টর ৯ (Factor IX) এর ঘাটতি হয়। যে কারণে শরীরের কোথাও থেকে রক্তক্ষরণ হলে তা আর জমাট বেঁধে বন্ধ হতে পারে না।

## প্রকারভেদ

১. রক্ত জমাট বাঁধার কোন উপাদান রক্তে অনুপস্থিত আছে কিনা তার ওপর ভিত্তি করে এ রোগের প্রকারভেদ করা হয়, যেমনঃ

- হিমোফিলিয়া এ (Haemophilia A) - যেখানে রক্তে ফ্যাক্টর ৮ (Factor VIII) অনুপস্থিত থাকে
- হিমোফিলিয়া বি (Haemophilia B) - যেখানে রক্তে ফ্যাক্টর ৯ (Factor IX) অনুপস্থিত থাকে

২. আবার রক্তে ফ্যাক্টর ৮ অথবা ৯ এর (Factor VIII or IX) পরিমানের ওপর ভিত্তি করেও এ রোগের প্রকারভেদ করা যায়। যেমনঃ

- মারাত্মক মাত্রার হিমোফিলিয়া (Severe Haemophilia)
- মধ্যম মাত্রার হিমোফিলিয়া (Moderate Haemophilia)
- সামান্য মাত্রার হিমোফিলিয়া (Mild Haemophilia)

## লক্ষণ

হিমোফিলিয়াতে আক্রান্ত ব্যক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

- অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের অভ্যন্তরে বা মাংসপেশির অভ্যন্তরে কোনো রকম আঘাত ছাড়া বা সামান্য আঘাতেই রক্তপাত ঘটে
- রক্তপাত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট স্থানে ফুলে যাওয়া, ব্যথা হওয়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে না পারা
- প্রস্রাব ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাওয়া
- মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

## রোগ নির্ণয়

হিমোফিলিয়া রোগ পারিবারিক ইতিহাস, রোগের লক্ষণ এবং রক্তের কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। পরীক্ষা গুলো নিচে দেয়া হলঃ

- ব্লিডিং টাইম - Bleeding Time (BT)
- ক্লটিং টাইম - Clotting Time (CT)
- প্রথ্রম্বিন টাইম - Prothrombin Time (PT)
- রক্তে ফ্যাক্টর ৮ ও ৯ লেভেল (Factor VIII & IX level)

## চিকিৎসা

- চিকিৎসার প্রথম ধাপ হলো রোগী ও তার পিতামাতাকে আশ্বস্ত করা
- যেহেতু মায়ের নিকট থেকে এই রোগ হয়, সেহেতু মায়ের মনে যেন অপরাধ বোধ না আসে যে তার জন্যই তার ছেলের এই অসুখ হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা
- স্কুলে গিয়ে শিশু যেন খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ না দেয় সে বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে
- দাঁতের যত্ন করতে হবে কেননা অল্প আঘাতেই রক্তক্ষরণ হতে পারে
- আক্রান্ত রোগীর মধ্যে যাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাদেরকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাতে হবে
- যারা মারাত্মকভাবে (Severe Haemophilia) আক্রান্ত তাদের প্রায়ই রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান (Factor-VIII & IX) দেয়া লাগতে পারে

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# সিফিলিস

বিশ্বজুড়ে সব যৌনরোগের শীর্ষে যে রোগটি, তার নাম সিফিলিস। সিফিলিস এর মূলে আছে একধরনের ব্যাক্টেরিয়া যার নাম হল ট্রিপোনেমা পেলিডাম *(Treponema pallidum)*। সিফিলিস এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে সংক্রমণ হয় সহবাস করবার সময়। যদি কারো সিফিলিস ফুশকুড়ি থাকে তবে তার সাথে শারিরিক স্পর্শ হলেও সিফিলিস হতে পারে। রক্ত আদান প্রদান এর মাধ্যমেও সিফিলিস হতে পারে।

## রোগের সুপ্তকাল

জীবাণু দেহে প্রবেশের পর রোগের প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিতে ৯ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২১ দিনের মধ্যেই প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

## সংক্রমণ

সিফিলিস বিভিন্ন ভাবে ছড়াতে পারে। নিচে সিফিলিস ছড়ানোর মাধ্যমগুলো দেয়া হলোঃ

- সিফিলিসে আক্রান্ত নারী বা পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের মাধ্যমেও সরাসরি অন্যের শরীরে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করতে পারে
- এছাড়া সিফিলিস আক্রান্ত মা থেকে নবজাতক শিশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে

## শ্রেণীবিভাগ

সিফিলিস রোগটিকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

- প্রাইমারিঃ এই অবস্থায় আক্রান্ত হবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর শরীরে পোকার কামড়ের মত গোল গোল দাগ দেখা যায়। মাঝে মাঝে এগুলো ব্যাথাহীন এবং শক্ত হয়ে দেখা দেয়। একে শ্যাঙ্কার বলা হয়
- সেকেন্ডারিঃ এই অবস্থায় সাধারণত শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানির মত হয় এবং নিয়মিত জ্বর, ওজন কমে যাওয়া এবং লসিকা গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। এছাড়া কুঁচকিতে ভেজা ফোস্কার মত দেখা দিতে পারে
- ল্যাটেন্টঃ এই অবস্থায় রোগ সুপ্ত অবস্থায় থাকে
- টারশিয়ারিঃ এটা অনেকদিন চিকিৎসা না করলে হয়। এই অবস্থায় রোগীর হৃদপিণ্ড, চোখ, মস্তিস্ক এবং নার্ভে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয় এবং রোগী সাধারণত বাঁচে না

## লক্ষণ

সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

- জ্বর ও মাথাব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়
- শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষ করে কুঁচকির গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে যেতে পারে
- সিফিলিস শুরুতে পুরুষের যৌনাঙ্গের মাথায় হালকা গোলাপি বর্ণের একটা দাগ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এটা বড় হয়ে ফোস্কা বা ঘায়ের মতো হয়ে যায়

## পরীক্ষা

- VDRL - ভেনারেল ডিজিজ রিসার্চ ল্যাবরেটরি টেস্ট
- RPR - রেপিড প্লাজমা রিয়াজিন টেস্ট
- TPHA - ট্রিপোনেমা পেলিডাম হেমাগ্লুটিনেশন এ্যাসে
- EIA - এনজাইম ইমিউনো এ্যাসে
- FTA Abs - ফ্লুরিসেন্ট ট্রিপোনেমাল এন্টিবডি এবজর্বড টেস্ট
- CSF - সি এস এফ পরীক্ষা
- Chest X-ray - বুকের এক্সরে

## চিকিৎসা

সিফিলিস রোগটি এতই ভয়ঙ্কর যে, চিকিৎসা না করলে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আর এ রোগটি এমনই যে মানুষ এর কথা গোপন করেই রাখতে চায়। আর এর বেশি ভুক্তভোগী হয় মেয়েরা। কারণ তারাই বেশি রোগ গোপন করে রাখতে চায়। এ রোগের চিকিৎসায় নিচের ওষুধগুলা ব্যবহার করা হয়ঃ

- Penicillin G injection
- Ceftriaxone
- Azithromycin
- Doxycyclin

## প্রতিরোধ

যাদের যৌন রোগ আছে তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে। যারা গর্ভবতী, যে সব মহিলা বার বার স্বামী থেকে পৃথক হয়, পতিতা, রক্তদাতা, শিল্প

প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, গাড়ীর চালক, সেনাবাহিনী, পুলিশ, যাযাবর, রেস্টুরেন্ট, হোটেল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ সকল শ্রেণীর লোকজনদের নিয়মিত VDRL Test করতে হবে। লোকজনদের অবশ্যই সিফিলিসের মহামারী ও মারাত্মকতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উপদেশ দিতে হবে। পতিতাবৃত্তি বন্ধ করা অথবা এর উপর কঠোর আইন প্রণয়ন করা অথবা শিক্ষার মাধ্যমে, চাকরির দ্বারা উচ্ছেদ করতে হবে। যৌন উত্তেজনা মূলক সাহিত্য, অশ্লীল ছবি, বই ইত্যাদি বিক্রি নিষেধ করতে হবে। বিবাহ বন্ধন ও বিবাহের পূর্বে পরীক্ষা করতে হবে। বংশগত সিফিলিসের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, গর্ভের প্রথম তিন মাসের সকল গর্ভবতী মহিলার VDRL পরীক্ষা করতে হবে। যদি কোন মহিলার সিফিলিস ধরা পড়ে তাহলে তার তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করতে হবে।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# ঘামাচি

ঘামাচি একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। গরমের সময় এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় ছোট বড় সবারই এই সমস্যা হতে পারে। এসব সাধারণ সমস্যাও অনেক সময় বেশ ক্ষতি করতে পারে। সাধারণত ঘামাচি তখনই হয় যখন ঘাম গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ঘাম বের হয় না এবং ত্বকের নিচে ঘাম আটকে যায়। এর ফলে ত্বকের উপরিভাগে ফুসকুড়ি এবং লাল দানার মত দেখা যায়। কিছু কিছু ঘামাচি খুব চুলকায়। ঘামাচি সাধারণত এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। তবে ঘামাচি সারানোর জন্য ত্বক সবসময় শুষ্ক রাখতে হবে এবং ঘাম শুকাতে হবে।

## কারণ

- গরম, আর্দ্র আবহাওয়া বা অতিরিক্ত তাপ
- কঠোর ব্যায়াম ও পরিশ্রমের ফলে ঘাম হলে
- ঘাম সহজে শুকায় না, এমন পোশাক পরলে
- শীতকালে খুব বেশি পোশাক পরলে
- অতিরিক্ত ক্রিম এবং মলম ব্যবহার করলে
- ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেঃ
  - মূত্রাশয়ের সমস্যার ঔষধ
  - উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ
  - ব্রণের ঔষধ
  - কেমোথেরাপির ঔষধ

## লক্ষণ

- ত্বকে লাল দানার মত দেখা দেয়
- ত্বক ফুলে ওঠে
- প্রচণ্ড চুলকানি হয়
- জ্বালাপোড়া ভাব থাকে

## আক্রান্ত স্থান

ঘামাচি সাধারণত ঘাড়ে, কাঁধে, বুকে, বগলে, কনুইয়ের ভাঁজে, কুঁচকিতে এবং ত্বকের যেসব জায়গায় ভাঁজ পড়ে বা কাপড়ের ঘষা লাগে সেসব জায়গায় হয়।

## চিকিৎসা

- রোগীর বয়সের উপর ভিত্তি করে যে সব স্থানে ঘামাচি হয়েছে ঠিক সে স্থানে চিকিৎসা দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে ক্যালামিন লোশন বা ট্রপিকাল স্টেরয়েড দেয়া যেতে পারে

## জটিলতা

- ঘামাচির ফলে অনেক সময় জীবাণুর সংক্রমণ হয়
- ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয়
- অতিরিক্ত গরমে ঘর্ম গ্রন্থি বন্ধ হয়ে শরীরকে পরিশ্রান্ত করে তোলে। এর ফলে নিম্ন রক্তচাপ অবসাদ, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা হয় এবং নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়। এর ফলে হিট স্ট্রোকও হতে পারে

## করণীয়

- গরমে হালকা, ঢিলেঢালা পোশাক পরা
- শীতে অতিরিক্ত পোশাক পরা থেকে বিরত থাকা
- ঘাম কমানো বা এড়ানোর জন্য ঠান্ডাযুক্ত স্থানে থাকতে হবে
- ঘুমানোর জায়গা ঠান্ডা এবং বাতাস চলাচল করতে পারে এমন হতে হবে

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

# ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "লিভার সিরোসিস" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ১৭ মে ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

**১) লিভার সিরোসিস থেকে নিচের কোন রোগটি হতে পারে?**

ক) হার্ট এট্যাক
খ) স্ট্রোক
গ) লিভার ক্যান্সার
ঘ) পাকস্থলীর আলসার

**২) বাংলাদেশে লিভার সিরোসিস এর প্রধান কারণ কোনটি?**

ক) যক্ষ্মা
খ) হেপাটাইটিস বি ভাইরাস
গ) এ্যালকোহল
ঘ) হেপাটাইটিস সি ভাইরাস

**৩) ফ্যাটি লিভার হওয়ার কারণ নয় কোনটি?**

ক) গাউট
খ) ডায়াবেটিস
গ) ওবেসিটি
ঘ) হাইপোথাইরয়ডিজম

**৪) ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত কত শতাংশ রোগীর পরবর্তীতে লিভার সিরোসিস হতে পারে?**

ক) ১০ শতাংশ
খ) ২০ শতাংশ
গ) ৩০ শতাংশ
ঘ) ৪০ শতাংশ

**৫) নিচের কোনটি লিভার সিরোসিস এর লক্ষণ নয়?**

ক) রক্তবমি হওয়া
খ) দুর্বলতা অনুভব করা
গ) পেট ফুলে যাওয়া
ঘ) কাশি হওয়া

**৬) এসাইটিস মানে কি?**

ক) ওজন কমে যাওয়া
খ) পেটে পানি আসা
গ) মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হওয়া
ঘ) পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া

**৭) নিচের কোনটি লিভার সিরোসিস এর নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা?**

ক) এলানিন এমাইনোট্রান্সফারেজ
খ) ভাইরাল মার্কার
গ) এম আর আই
ঘ) লিভার বায়োপ্সি

**৮) নিচের কোন খাবারটি লিভার সিরোসিসে পরিহার করা উচিৎ?**

ক) প্রোটিন
খ) তেল
গ) শ্বেতসার
ঘ) ভিটামিন

**৯) লিভারের কার্যকারিতা ভালো থাকলে কত শতাংশ রোগী ১০ বছর বেঁচে থাকে?**

ক) ২৫%
খ) ৩০%
গ) ৪০%
ঘ) ৪৫%

**১০) হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে কি করা উচিৎ?**

ক) শিরায় নেশাদ্রব্য ব্যবহার করা
খ) অনিরাপদ রক্ত গ্রহণ করা
গ) ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্ক করা
ঘ) হেপাটাইটিস বি টিকা নেয়া

# ডিমের ৯ টি বিস্ময়কর উপকারিতা

সবারই পছন্দের খাবার হল ডিম। সকালের নাস্তায় ডিম ছাড়া যেন নাস্তাই করা হয় না। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ডিম খেতে ভালবাসেন না এমন মানুষ খুব কমই আছে। ডিম সেদ্ধ, ডিম পোঁচ অথবা ডিম দিয়ে যে কোন রান্না খুবই জনপ্রিয় বিশ্বজুড়ে। এখানে ডিম কিভাবে আমাদের উপকার করছে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

## ১ দেহের হাড় মজবুত করে

ডিমে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি যা আমাদের দেহের ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করে থাকে এবং ডিমে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উপস্থিতি অস্টিওপোরোসিস বন্ধ রাখে এবং দেহের হাড় মজবুত হতে সাহায্য করে।

## ২ মস্তিষ্কের জন্য উপকারি

ডিমে আছে প্রচুর পরিমাণে কলিন যা নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। এটা আমাদের দেহকে সুস্থ রাখে। ডিম আমাদের মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া ডিমের কুসুমে আছে ফলেট উপাদান যা আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে স্নায়ু কোষের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

## ৩ দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণ করে

আমাদের দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে ডিমের উপকারিতা অনেক। যারা পেশির ওজন বৃদ্ধি করতে চান তাদের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম উপযুক্ত। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডিম আমাদের দেহে ঘন ঘন ক্ষুধা লাগাকে কমিয়ে দিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

## ৪ নখ ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে

ডিমে আছে সালফার সমৃদ্ধ অ্যামিনো এসিড যা আমাদের হাতের নখের স্বাস্থ্যই শুধু উন্নত করেনা আমাদের চুলের স্বাস্থ্যও মজবুত করে ও আকর্ষণীয় করে তুলে। ডিমের অন্যান্য খনিজ পদার্থ সেলেনিয়াম, আয়রন ও জিঙ্ক দেহের নখ ও চুলের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সহযোগীতা করে।

## ৫ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে

ডিমের অবস্থিত লুটিন ও যেক্সানথিন এই দুটি ক্যারটিনয়েড আমাদের চোখের সুস্থ দৃষ্টি নির্ধারণে সাহায্য করে। ডিমের এই উপাদান গুলো আমাদের চোখের ছানি, মেকুলার পতন ও সূর্যের বেগুনী রশ্মি থেকে আমাদের চোখকে রক্ষা করে।

## ৬ স্তনের ক্যানসার রোধ করে

স্তন ক্যানসার বর্তমান সময়ের খুবই পরিচিত একটা রোগ। এই স্তন ক্যানসার নিরাময়ে ডিমের ভূমিকা অন্যতম। গবেষণার পরামর্শ অনুযায়ী বলা হয়েছে যে প্রতি সপ্তাহে ৬ টি করে ডিম খেলে স্তনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভবনা ৪০% কমে যায়।

## ৭ ডিম সহজেই হজম হয়

ডিম খুব দ্রুত হজম হয়ে যায় আমাদের দেহে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য ডিম দারুন উপকারী খাবার। কারণ ডিম যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন এটি খুব দ্রুত হজম হয়।

## ৮ প্রয়োজনীয় প্রোটিন সরবরাহ

প্রোটিন শরীর গঠন করে। আর প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে অ্যামিনো অ্যাসিড। একুশ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড এই কাজে প্রয়োজন পড়ে। আমাদের শরীর অতি প্রয়োজনীয় নয়টি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না। তার জন্য আমাদের প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট নিতে হয়। খাবারের মধ্যে এই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট হল ডিম যা শরীরে প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে।

## ৯ রক্তে ডিমের প্রভাব

নতুন সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ডিম কোলেস্টেরল বাড়ায় না। দিনে দুটো ডিম শরীরের লিপিড প্রোফাইলে কোনও প্রভাব ফেলে না। বরং ডিম রক্তে লোহিতকণিকা তৈরি করে।

*তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট*

ADVANCING
POSSIBILITIES